ইসলামী সমাজ গঠনে

নারী সমাজের ভূমিকা

হাফেজা আসমা খাতুন

ইসলামী সমাজ গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা

হাফেজা আসমা খাতুন

তাইয়্যিম বুক কর্ণার
৪৩৫/ক, ওয়্যারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবা: ০১৭০৪-৬০১৯১৯

ইসলামী সমাজ গঠনে
নারী সমাজের ভূমিকা

হাফেজা আসমা খাতুন

প্রকাশনায়:
তাইয়্যিম বুক কর্ণার
৪৩৫/ক, ওয়্যারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা।
মোবা: ০১৯১৪-৩৬৬৩৭৬

প্রকাশকাল:
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর-১৯৯২ ঈসায়ী
সপ্তম মুদ্রণ : মার্চ-২০২৪ ঈসায়ী

স্বত্ব: লেখিকার

মুদ্রণে : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

নির্ধারিত মূল্য : ৩০.০০ টাকা মাত্র

Islami Samaj Ghathone Nari Samajer Bhomika, Written by
Hafeza Asma Khaun, Published by Taiyem Book Corner
Fixed Price Tk. 30.00 Only

ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিটি নারীকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আর তা হচ্ছে, আদর্শ মানুষ ও জাতি গড়ার দায়িত্ব। নারীদের এ মহান দায়িত্ব পালনের উপর নির্ভর করছে ইসলামী সমাজ গঠনের সূচনা। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার উপর নির্ভর করছে সমগ্র জাতির সার্বিক কল্যাণ। আদর্শ, চরিত্রবান, সুনাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে মায়েদের উপর। সে দায়িত্বই হচ্ছে, মানবসমাজের সবচেয়ে বড় মহান দায়িত্ব। একটি আদর্শ, সুখী, সুন্দর পরিবার নির্ভর করছে একজন আদর্শ মাতা, একজন আদর্শ স্ত্রীর উপর।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত একজন নারী যখন মা হন, তখন তিনি সেই শিক্ষা দ্বারা তার সন্তানকে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। যে সন্তান দ্বারা সমাজ তথা সমগ্র জাতি উপকৃত হতে পারে। একইভাবে সেই নারী যখন একজন স্ত্রী, তখন তিনি তার সেই শিক্ষা, সুন্দর ব্যবহার ও মিষ্টি আচরণের দ্বারা তার স্বামীর মন জয় করে স্বামীকে একজন আদর্শ স্বামী ও সুনাগরিক হিসেবে সমাজকে উপহার দিতে পারেন। এভাবেই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত একজন নারী একটি পরিবারকে আদর্শ পরিবার হিসেবে গড়ে তুলতে অবদান রাখতে পারেন। একটি আদর্শ পরিবার সমাজের ভিত্তি। কাজেই ইসলামী আদর্শভিত্তিক সমাজ গঠনে একজন মা, একজন স্ত্রীকে অবশ্যই আদর্শ সম্পর্কে, চরিত্রের মৌলিক উপাদান সম্পর্কে সুষ্ঠু ও নির্ভুল জ্ঞান রাখতে হবে। ওহীপ্রাপ্ত জ্ঞানই একমাত্র নির্ভুল জ্ঞান। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতির জন্য ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, কল্যাণ-অকল্যাণের যে মানদণ্ড নির্ধারণ করে পাঠিয়েছেন, তা-ই হচ্ছে একমাত্র নির্ভুল মানদণ্ড। ইসলামী সমাজ গঠনে নারীদের অবশ্যই এ মানদণ্ড সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান থাকতে হবে। আর এই নির্ভুল জ্ঞান, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদণ্ডই হচ্ছে, আল কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। এ দুটি নির্ভুল জ্ঞানের উৎস থেকে অবশ্যই মুসলিম নারীদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং সর্বপ্রথম সে জ্ঞানকে নিজেদের জীবনেই প্রয়োগ করতে হবে। এরপর মায়েরা, স্ত্রীরা পরিবারে তা প্রয়োগ করবেন। এভাবে একটি পরিবার থেকে একটি সমাজ, সমাজ থেকে দেশ এবং একটি আদর্শ জাতি গড়ে উঠতে পারে এবং নারীরা তাদের মহান দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

হাফেজা আসমা খাতুন

সাবেক এম পি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামী সমাজ গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা

'ইসলামী সমাজ গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা শুরু করার আগে ইসলাম ও মুসলিম শব্দ দুটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা। 'মুসলিম' শব্দের মানে হচ্ছে, আনুগত্যকারী বা আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহর আদেশের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নামই হচ্ছে ইসলাম। মুসলিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে বিনা দ্বিধায় ও সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর বিধান কুরআন মাজীদের আদেশ-নিষেধের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং রাসূলের আদর্শ ও শিক্ষার পূর্ণ আনুগত্য করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ ○

"হে নবী! এসব লোক যদি আপনার সাথে তর্ক-বিতর্ক করে, তবে তাদেরকে বলে দিন যে, আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি।" [সূরা ৩; আলে-ইমরান-২০]

মুখে মুখে ঈমানের দাবির কোনো মূল্য নেই এবং এ দ্বারা পরিত্রাণেরও কোনো উপায় নেই। কুরআন মাজীদের কোথাও নেই যে, যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট মহা পুরস্কার; বরং বলা হয়েছে, 'যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, সালাত কায়েম করেছে, যাকাত প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট মহা পুরস্কার। তারা ভীত হবে না, দুঃখিতও হবে না।'

ওয়াদা ভঙ্গকারী বা পরাজিত মুশরিক ঈমান গ্রহণ করলেই তার পথ ছেড়ে দেয়া হয় না। বলা হয়েছে,

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ○

“যদি সে তাওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তখন তার পথ ছেড়ে দাও।” [সূরা ৯; আত-তাওবা-৫]

আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কাফির-মুশরিক ঈমান গ্রহণ করলেই মুসলমানের ভাই হয়ে যায় না; যতক্ষণ না সে সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

فَإِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ○

“যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।” [সূরা ৯; আত-তাওবা ১১]

এ মহান বাণীসমূহ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, মুখে ঈমানের দাবির কোনো মূল্য নেই, যদি তা বাস্তবে প্রমাণ করা না হয়। সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত হচ্ছে ঈমানের বাস্তব প্রমাণ বা বহিঃপ্রকাশ।

কুরআন মাজীদের বিধান ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর নির্দেশ। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ○

“তোমরা দ্বীনকে কায়েম করো। এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য করো না।” [সূরা ৪২; শূরা-১৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَاَ

كَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ○

“যদি তারা তাওরাত, ইনজীল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি নাযিল করা কিতাবসমূহকে কায়েম করতো, তাহলে তাদের মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে রিযক প্রদান করা হতো।” [সূরা ৫; মায়িদা ৬৬]

কুরআন মাজীদ শুধু বাণী হিসেবেই নাযিল হয়নি; যদি শুধু পাঠ করার জন্য বা খতমের পর খতম করে পুণ্য হাসিলের জন্য নাযিল হতো তাহলে আল্লাহ

তা'আলা আল কুরআন একদিনেই নাযিল করতে পারতেন। আল কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবরচিত প্রচলিত, ভ্রান্ত, জীবনব্যবস্থা নির্মূল করে সেখানে আল্লাহর দেয়া একটি নির্ভুল, নিরপেক্ষ, সার্বিক কল্যাণকর আল ইনসাফপূর্ণ জীবনব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। তাই আল কুরআন ধীরে ধীরে নাযিল হয়েছে, যাতে ঈমান গ্রহণকারীরা ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে আল কুরআনের দেয়া জীবনব্যবস্থাকে নিজেদের ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আল কুরআন দীর্ঘ ২৩ বছরে নাযিল হয়েছে। আর দুনিয়াবাসী বিস্ময়ের সাথে দেখতে পেল, মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধানে একটা জাতির জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। একটি বিস্ময়কর বিপ্লব। এই বিপ্লব নবী করীম (সঃ) ছাড়া অন্য কেউ দুনিয়ার কোনো দেশে কোনো কালে ঘটাতে পারেনি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক অর্থাৎ মানবজীবনের সর্বদিকে একটি পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধিত হলো। নিষ্ঠুর বর্বর আরব জাতি মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধানে একটি সুসভ্য, মার্জিত, আদর্শ জাতিতে পরিণত হলো। সে সমাজে তৈরি হলো আবূ বকর, ওমর, ওসমান, আলী (রাঃ)-এর মতো চরিত্র। বীর হামযার মতো সাহসী যোদ্ধা, আবু হোরায়রা, ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতো ধৈর্যশীল, খালেদ ইবনে ওয়ালীদের মতো, তারেক, মূসার মতো সাহসী সেনাপতি, খাদিজা-আয়েশা (রাঃ) এর মতো বিদূষী নারী, সুমাইয়ার মতো আত্মত্যাগী মহিলা। কিন্তু কী করে এ বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হলো? কেমন করে হলো?

আল্লাহর রাসূল (সঃ) নিজে কোনো মনগড়া মতবাদ প্রচার করেননি। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কুরআনের পূর্ণ বিধানকে তাঁর নিজের উপর এবং তাঁর জাতির উপর পূর্ণভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। কুরআনের কোনো বিধানকে বা নির্দেশকে ছাঁটাই করার দুঃসাহস করেননি। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করার আদেশ দিয়েছেন, প্রতিটি আদেশকে তিনি পূর্ণভাবে কার্যকর করেছেন। যারা আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আল্লাহ ছাড়া অন্যসব মাবুদকে অস্বীকার করেছিলেন। তারা মানুষের, নাফসের, সমাজের সব রকমের

দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দাসত্ব এমনভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, নবী করীম (স:)-এর মাধ্যমে যত আদেশ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল হতো, প্রতিটি আদেশকে ঐ জাতি নিজেদের জীবনে কার্যকর করেছেন এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে ঐ জাতি বিরত হয়ে গেছেন। শুধু মানুষের স্রষ্টা প্রদত্ত নির্ভুল জীবনবিধান কুরআনকে নিজেদের জীবনে বাস্তবে প্রয়োগ করেই ঐ জাতির জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং একটি পরিপূর্ণ সমাজবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। কাজেই আমাদের মুসলমানদের নতুন করে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে যে, কুরআন একখানা ধর্মগ্রন্থ মাত্র নয়; এ একখানা বিপ্লবী গ্রন্থ। যে গ্রন্থের বাস্তব প্রয়োগে একটি জাতির প্রাণ সঞ্চার হতে পারে, যে গ্রন্থকে ধারণ করে একটি জাতি জেগে উঠতে পারে, সার্বিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে। এ গ্রন্থ হচ্ছে স্রষ্টার দেয়া নির্ভুল জীবনবিধান আল কুরআন। যারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর এই কিতাবের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে আল্লাহর রাসূলের কাছে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তাদের প্রতি যেদিন সালাত কায়েমের নির্দেশ এলো, সে মুহূর্ত থেকে কোনো মুসলমান ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত সালাত কাযা করেননি। এখানে বলা আবশ্যক যে, 'বে-নামাযী মুসলমান' থাকার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। হাদীসে বলা হয়েছে, মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত। মুসলমান সালাত আদায় করে, কাফির তা করে না- এভাবেই পার্থক্য করা হয়েছে। রাসূল (স:) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন বে-নামাযীকে ফিরাউন, হামান, কারুন, ওবাই ইবনে খালফ, উমাইয়া ইবনে খালফদের সাথে একত্রে উঠানো হবে।' অর্থাৎ তাদের দলভুক্ত হবে। রাসূল (স:)-এর যুগে বে-নামাযীকে মুসলমান মনে করা হতো না। তাই তখন মুনাফিকরাও সালাত আদায়ে শামিল হয়ে যেত। যাতে তাদেরকে মুসলমান বলে গণ্য করা হয়। তেমনিভাবে যেদিন মদ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আয়াত নাযিল হলো-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ ○

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না।"
[সূরা ৪; আন-নিসা ৪৩]

চিরকালের মদ্যপায়ী জাতি তারা। হঠাৎ তাদের উপর মদ নিষিদ্ধ করা হয়নি। নবুওয়াতের তেরো বছর পর্যন্ত তাদেরকে শুধু আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আখিরাতের প্রতি ঈমানের ধারণাই দেয়া হয়েছে। তিনি যে এক, একক, তিনিই যে একমাত্র রব, মনিব, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, তিনি মানুষকে যে আইনবিধান দিয়েছেন, তা-ই মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণকর আইন-বিধান। তাঁর আইনবিধান অমান্য করা হলে মানুষ যে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তিনি যে সবকিছু দেখেন ও শোনেন, তাঁর কাছে সব মানুষকে যে একদিন ফিরে যেতে হবে, সেদিন দুনিয়ায় কে তাঁর আদেশ মতো জীবনযাপন করে দুনিয়াতে শান্তি ও কল্যাণের সাথে জীবনযাপন করেছে এবং কে আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হয়ে দুনিয়াতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে এর প্রতিটি হিসাব-নিকাশ আখিরাতের আদালতে আল্লাহর দরবারে দিতে হবে। এই ধারণা দেয়া হয় নবুওয়াতের পর দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে। তারপর আল্লাহর রাসূলকে যে মানবজাতির জন্য রাসূল হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মনোনীত করে পাঠিয়েছেন, মানবজাতির জন্য তিনিই যে একমাত্র নির্ভুল আদর্শ, সমগ্র মানবজাতি যদি দুনিয়াতে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ পেতে চায় এবং আখিরাতে মুক্তি চায় তাহলে একমাত্র তাঁকেই যে অনুসরণ করতে হবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি বিভাগে তাঁরই উপস্থাপিত আদর্শ অনুসরণ করেই যে দুনিয়াবাসী যাবতীয় সমস্যা ও বিপর্যয় থেকে বাঁচতে পারে- এ ধারণাও দেয়া হয়েছে নবুওয়াতী জিন্দেগীর তেরোটি বছর ধরে।

তারপর আখিরাতের প্রতি ঈমানদারদের দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে বলা হয়েছে। আখিরাত যে সত্য, এ দুনিয়ার জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, এখানে যে চিরকাল থাকার জন্য কেউ আসেনি, আখিরাত যে চিরস্থায়ী জীবন, দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি ভালো কাজ ও মন্দকাজের হিসাব-নিকাশ যে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে দিতে হবে, সেদিন যে কেউ কারো সাহায্যকারী বন্ধু থাকবে না- এসব ধারণা দেয়া হলো তেরোটি বছর ধরে। তারপর মুসলমানগণ মদীনায় যখন হিজরত করে কিছুটা সংগঠিত হলো, কিছুটা শক্তি অর্জন করলো, আল্লাহর রাসূলেরও মদীনায় হিজরতের সময় ঘনিয়ে এলো, মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনা হবে, এমন সময় নাযিল হতে

লাগল বিভিন্ন বিধি-বিধান। পর্যায়ক্রমে সালাতের বিধান, পর্দার বিধান, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, পাশা খেলা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। চুরি-ডাকাতি, খুন- ব্যভিচারের শাস্তির বিধান নাযিল হলো।

যেদিন পর্দার বিধান নাযিল হলো,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ○

"তোমরা যখন নবীর বিবিদের কাছে কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও।" [সূরা ৩৩; আল-আহযাব ৫৩]

এ বিধান নাযিল হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাঁর বিবিগণের মাঝে এবং ঘরে উপস্থিত সাহাবীগণের মাঝে একটি পর্দা টেনে দিলেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূল (সঃ)-এর যুগে কোনো মেয়েকে এবং নবীর বিবিগণকে আর সাহাবীদের সামনে আসতে দেখা যায়নি।

যখন কুরআন নাযিল হলো,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ أَدْنٰٓى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ○

"হে নবী আপনি আপনার বিবিদের, কন্যাদের এবং মুমিন নারীদের বলে দিন (তারা যখন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হয় তখন) তারা যেন নিজেদের উপর একটি বড় চাদর ঝুলিয়ে দেয়, যাতে তাদের চেনা যাবে, ফলে তারা উত্যক্ত হবে না।" [সূরা ৩৩; আল-আহযাব ৫৯]

আল কুরআনে এ নির্দেশ এসে যাওয়ার পর রাসূলের যুগে পর্দাহীনভাবে কোনো মেয়েকে কোনোদিন প্রকাশ্য ময়দানে দেখা যায়নি।

তেমনিভাবে যেদিন মদ সম্পূর্ণ হারাম করা হলো, সেদিন থেকে কোনো মুসলমান মদ স্পর্শ করেননি। যেদিন মুসলিম নারীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দেয়া হলো, সেদিন থেকে কোনো মুসলিম নারীকে প্রকাশ্যে ময়দানে

বেপর্দায় দেখা যায়নি। তারা আল্লাহর নির্দেশমতো পর্দা করে বাইরের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

যে দিন ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হলো এবং গরীবদের মাঝে তা বন্টনের নির্দেশ এল, সেদিন থেকে নবী করীম (স:)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকার ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরীবের মাঝে তা বন্টন করতে লাগলেন। কুরআন মাজীদে ধনী মুসলমান সম্প্রদায়কেও স্বেচ্ছায় যাকাত আদায় না করার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হলো। কুরআন মাজীদে ঘোষণা দেয়া হলো,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

“আর যারা সোনা ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। একদিন আসবে, যখন এসব (সোনা-রুপাকে) দোযখের আগুনে গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে সেঁকা দেয়া হবে- এটাই ঐ ধন-সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। এখন নিজেদের জমানো ধন-দৌলতের স্বাদ গ্রহণ করো।” [সূরা ৯; আত-তাওবা ৩৪-৩৫]

এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ থেকে সূদী কারবার, জুয়া, ব্যভিচার, শিশুহত্যা, দাসপ্রথা সবকিছু একটি একটি করে নির্মূল করা হলো। এভাবে আল কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবেশীর হক, আত্মীয়তার হক ও গরীবের হক প্রতিষ্ঠা করলেন। নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। এভাবে কুরআনের নির্দেশকে বাস্তবায়িত করে নবী করীম (স:) একটি জাতিকে পুনর্গঠিত করে ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেন।

এতক্ষণের দীর্ঘ আলোচনায় আমি এ কথা পরিষ্কার করে বলতে চেয়েছি যে, ইসলামী সমাজ তাকেই বলা হয়, যে সমাজে আল্লাহপ্রদত্ত পরিপূর্ণ জীবনবিধান আল কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের সুন্নাহ পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইসলামী সমাজই হচ্ছে ইসলামের প্রাণশক্তি ও মূল সৌন্দর্য। যাকে বলা হয়, Beauty of Islam। ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামের সৌন্দর্য, কল্যাণকারিতা কোনোদিন উপলব্ধি করা যাবে না। মানুষের মনগড়া আইন-বিধান, মতবাদ, রসম- রেওয়াজ, কুসংস্কার, অন্যায়-অনাচার, পাপ-যুলুম, শোষণ-অত্যাচার সবকিছু নির্মূল করে নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী সমাজের পুনর্গঠনই হচ্ছে ইসলামের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জিত না হলে ইসলামের কল্যাণ লাভ করা কোনোদিন সম্ভব নয়। এ দায়িত্বই নবী-রাসূলগণ পালন করেছেন। সর্বশেষ নবীর উপরে এ দায়িত্বই আল্লাহ তা'আলা অর্পণ করেছিলেন। বর্তমানে এ দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মাদী (সঃ), মুসলিম জাতির উপর ন্যস্ত হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই নবী-রাসূলগণ বাতিল সমাজের মুখোমুখি হয়েছেন। ইবরাহীম (আঃ) নমরূদের, ফিরাউনের সাথে মূসা (আঃ)-এর, নবী করীম (সঃ)-এর সাথে সমসাময়িক কাফির-মুশরিক গোত্রীয় প্রধানদের সংঘাত এ সত্যতারই প্রমাণ বহন করে। কিন্তু এই সংঘাত ছিল সত্যের সাথে বাতিলের। যাকে কুরআনের ভাষায় 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলা হয়েছে। বদর, ওহুদ, খন্দক, হুনাইনের যুদ্ধ- এ সবই হচ্ছে সত্যের সাথে বাতিলের সংগ্রাম, সংঘাতের ইতিহাস। এ হচ্ছে আদর্শের সাথে সংঘাত; ব্যক্তির সাথে নয়। সমাজে যখন পাপ, অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি, শোষণ, যুলুম কায়েম থাকে তখন সে সমাজে সততা, ন্যায় ও ইনসাফের বিধান ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা কঠিন কাজ। বাতিল সমাজ সহজে পথ ছেড়ে দেয় না। কিন্তু নবী-রাসূলগণ শত নির্যাতনের মুখেও বাতিল সমাজের সাথে আপোস করেননি। ইসলাম মানব সমাজে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে মানুষ কোনো দিন শান্তি ও কল্যাণের মুখ দেখতে পাবে না। তাই সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ শত কষ্ট- নির্যাতনের মুখেও শি'আবে আবী তালিবে কঠোর বন্দীজীবন সহ্য করেও বদর, ওহুদ, খন্দকে বাতিলের সাথে প্রয়োজনে

অস্ত্রের মোকাবেলা করেও ইসলামী সমাজ, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন, ইসলামী সমাজে, ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষ কতখানি ন্যায়, ইনসাফ, সুবিচার এবং শান্তি ও কল্যাণ পেতে পারে। সেই ইসলামী সমাজ, ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের দায়িত্বই বর্তমানে মুসলিম উম্মার উপর ন্যস্ত রয়েছে।

কোনো আদর্শ বাস্তবায়নের কাজ পুরুষের একার পক্ষে সম্ভব নয়। নারী-পুরুষ মানব সমাজের দুটি অপরিহার্য অঙ্গ। একে অপরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অপরটির চলা অসম্ভব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের কর্মক্ষেত্র বণ্টন করে দিয়েছেন এবং যার যার কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তাও অপরিহার্য। ইসলামী সমাজ গঠনে নারীসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা, নারীসমাজে ইসলামের প্রচার-প্রসার নারীর পক্ষেই সম্ভব। ইসলামের সীমা লঙ্ঘন না করে নারী-পুরুষকেও ইসলামী সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। স্ত্রী তার স্বামীকে, বোন তার ভাইকে, মা তার সন্তানকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারেন। নবী করীম (স:)-এর ইসলামী আন্দোলনে আমরা মুসলিম নারীদেরকে সমভাবে অংশিদার দেখেছি। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী নওমুসলিমদের ১৪ জনের মধ্যে ৪ জনই ছিলেন নারী। দ্বিতীয়বার হিজরতকারী ৭০ জন মুসলমানের মধ্যে ১১ জনই ছিলেন নারী। কুরাইশ বংশের ধনবতী মহিলা বিবি খাদিজা (রা:) নবী করীম (স:)-এর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ ইসলামী আন্দোলনে নওমুসলিমদের সাহায্যে ব্যয় করেন। ধনী ব্যবসায়ী আবূ বকর, ওসমান, ওমর (রা:)-এর সমস্ত সম্পদ অসহায় নওমুসলিমের হিজরতে, পুনর্বাসনে, বিরোধীদের মোকাবেলায় যেমন ব্যয় হয়েছে, তেমনি মুসলিম নারীরাও তাদের অর্থ, সম্পদ ব্যয় করেছেন। বাতিল শক্তির মোকাবেলায় মুসলিম পুরুষদের সঙ্গে মুসলিম নারীরাও যুদ্ধের ময়দানে অংশ নিয়েছেন। মুসলিম নারীরা যুদ্ধরত সৈনিকদের ক্যাম্প পাহারা দিয়েছেন, আহত সৈনিকদের কাঁধে করে মদীনায় স্থানান্তর করেছেন, প্রয়োজনে অস্ত্র ধরেছেন। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ইসলাম মায়ের জাত নারীকে দিয়ে অস্ত্র ধরার কাজ করায়নি। শুধু নারীকে তার ইজ্জত এবং জীবন রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণের অনুমতি দিয়েছে। মুসলিম নারীরা প্রয়োজনে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন,

সেখানে জরুরি অবস্থায় তারা নেকাব ফেলে মুসলিম সৈনিকের সাহায্য করেছেন; কিন্তু সুস্থ পরিবেশে তারা সেসব সৈনিকদের সামনে পর্দা রক্ষা করে চলেছেন। বিবি আয়েশা (রা:) পর্দার আড়াল থেকে পুরুষ সাহাবীদেরকেও হাদীস শিক্ষা দিতেন। মুসলিম নারীরা পুরুষদের সঙ্গে হজ্জে গমন করেছেন। জামাআতে সালাত আদায় করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলিম নারীরা শুধু ইশার জামাআতে এবং ফজরের জামাআতে অংশগ্রহণ করতেন এবং ফজরের জামাআত সেরে নারীরা অন্ধকার থাকতেই চলে যেতেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তখন তাদের চেনা যেত না। জুমুআর জামাআত এবং ঈদের জামাআতেও নারীরা শামিল হতেন। এভাবে ইসলামের নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে মুসলিম নারীরা ইসলামী সমাজ গঠনে সমভাবে অংশ নিয়েছেন।

ইসলামী সমাজ গঠনের দায়িত্ব মুসলিম নারী-পুরুষের উভয়ের উপর আল্লাহ তা'আলা ন্যস্ত করেছেন। কুরআন মাজীদে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ أُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা ভালো কাজের হুকুম দেয়, মন্দ কাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে। এরাই ঐসব লোক, যাদের উপর অবশ্যই আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। এই মুমিন পুরুষ ও নারীদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা

করেছেন যে, তাদেরকে এমন বাগ-বাগীচা দান করবেন, যার নিচে ঝরণাধারা বহমান থাকবে এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ঐ চির সবুজ বাগানে তাদের থাকার জন্য পাক-পবিত্র জায়গা থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করবে- এটাই বড় সফলতা।" [সূরা ৯; আত-তাওবা ৭১-৭২]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ○

"এখন তোমরাই দুনিয়ার ঐ সেরা উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য ময়দানে আনা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ করো ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।" [সূরা ৩; আলে ইমরান ১১০]

এখানে كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ বলে মুসলিম নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। এসব আয়াতে নারী-পুরুষ উভয়কে সমভাবে আল্লাহর দ্বীন-ইসলাম সমাজে কায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, দ্বীন-ইসলাম যখন সমাজে কায়েম না থাকে, তখন দ্বীন-ইসলাম কায়েম করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের উপর ফরযে আইন, ফলে নারীর উপরেও তা সমভাবে প্রযোজ্য।

নবী করীম (সঃ) পূর্ণ ইসলামকে একটি প্রাসাদের সাথে তুলনা করেছেন এবং ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতকে ইসলামের ৫টি স্তম্ভের সাথে তুলনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব, বন্দেগী করা যাবে না); মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (অর্থাৎ তাঁর আদর্শ, তাঁর নির্দেশিত পথই একমাত্র নির্ভুল)।'

কাজেই তিনি মানবজাতির একমাত্র আদর্শ নেতা- এ কথা স্বীকার করা এবং বাস্তবে অনুকরণ করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা, রমযান মাসে রোযা রাখা। ইসলামের এই পাঁচটি স্তম্ভ মুসলিম পরিবারে, সমাজে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে ইসলামী সমাজ গঠনের সূচনাই হতে পারেনা এবং সে সমাজে ইসলামের প্রাসাদ তৈরি করা আদৌ সম্ভব নয়।

ইসলামী সমাজ গঠনের চিন্তা-ভাবনা করার আগে আসুন বাংলাদেশে ইসলামের এই পাঁচটি স্তম্ভের অবস্থান আমরা যাচাই করে দেখি। বাংলাদেশে শতকরা ৯০টি পরিবার মুসলিম। তাদের পরিবারে ঈমান কী অবস্থায় আছে তা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এ জিনিসটি হলো মনের ব্যাপার। সেটা আল্লাহ তা'আলাই যাচাই করবেন; কিন্তু ঈমানের বীজ কারো মাঝে বপন করা হলে তা অঙ্কুরিত হবে না- এটা সম্ভব নয়। ঈমানের বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাত। এগুলো দিয়েই আমরা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের যাচাই করতে পারবো।

বাংলাদেশে শতকরা ৯০টি মুসলিম পরিবারের প্রতিটি সদস্য কি নামাযী? যদি না হয়, তবে বুঝতে হবে, পরিবারের কর্তা, গৃহিণী তাদের পরিবারে সালাত কায়েম করেননি। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক কি নামাযী? যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে রাষ্ট্র নাগরিকদের উপর সালাত কায়েম করেনি। অথচ সালাত কায়েমের জন্য কুরআন মাজীদে ৮২ জায়গায় সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। সাত বছর বয়স থেকে সন্তানকে নামাযের তালিম দেয়ার জন্য পিতামাতার প্রতি নির্দেশ রয়েছে। দশ বছর বয়স থেকে সন্তানকে নামাযে অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে বলা হয়েছে। কারণ, ১২/১৩ বছর বয়সে ছেলেমেয়েদের মাঝে যখন সাবালকত্বের চিহ্ন দেখা দেবে, তখন থেকে নামায তাদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। তখন বিনা ওযরে এক ওয়াক্ত সালাত নষ্ট করা যাবে না। বিনা ওযরে সালাত নষ্ট করা কবীরা গুনাহ। বাংলাদেশে মুসলিম পরিবারের কয়জন পিতামাতা এ ব্যাপারে সজাগ-সচেতন আমার জানা নেই।

মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিও সালাত কায়েমের নির্দেশ রয়েছে। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ○

"তারাই ঐ সব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দেই, তাহলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে।" [সূরা ২২; আল-হাজ্জ-৪১]

রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের উপর পূর্ণভাবে সালাত কায়েম করতো, তাহলে রাষ্ট্রের চেহারা পাল্টে যেতো। সমাজ দুর্নীতি, পাপ, অন্যায় অশ্লীলতা থেকে মুক্ত হতো। যে ব্যক্তি বুঝে-শুনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আল্লাহর সামনে হাজিরা দেয়, তার পক্ষে দুর্নীতি, অন্যায়, পাপ, অশ্লীল কাজ করে পুনরায় আল্লাহর সামনে হাজিরা দেয়া কঠিন কাজ। যদি বা দু চারজন এমন হতভাগা থাকে, যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে, তাদের দায়িত্ব আল্লাহর উপরই ছেড়ে দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা মাউনে এসব নামাযীকে লা'নত করেছেন, যারা লোক দেখানো সালাত আদায় করে। মুসলমানদের উপর বছরে ৩০ রোযা ফরয করেছেন। অথচ অনেক মুসলমান রোযা রাখেন না, গোপনে পানাহার করেন। তেমনিভাবে যাকাত ব্যবস্থাও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই। যার ফলে সমাজে দারিদ্র্য, বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। সরকার যদি প্রথমে সালাত কায়েম না করে, তাহলে সমাজের দুর্নীতি দূর হবে না, মানুষের চরিত্র সংশোধন হবে না। অসচ্চরিত্র দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের হাতে জনগণ যাকাত তুলে দিতে রাজি হবে না।

হজ্জ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর ফরয করেছেন; কিন্তু সরকারের হুকুম ছাড়া আল্লাহর সেই ফরয হুকুম ধনী হলেও আদায় করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ফরয স্তম্ভের অবস্থা এই। কাজেই বোনেরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারছেন যে, ইসলামী সমাজ গঠনের সূচনায় আমাদের প্রথমে এই পাঁচটি স্তম্ভের দিকেই

নজর দিতে হবে। নবী করীম (স:) যখন একজন দায়িত্বশীলকে একটি বিজিত দেশে শাসনকর্তা করে পাঠান, তখন বলে দিলেন, 'তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে আহলে কিতাবদের বসবাস। তুমি প্রথমে তাদেরকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'- এই দাওয়াত দেবে। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা সালাত আদায় করে, তাহলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের প্রতি বছরে ত্রিশ রোযা ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে বলবে, আল্লাহ ধনী মুসলমানদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তখন তুমি ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরীবের মাঝে তা বিলি-বণ্টন করে দেবে।'

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ইবাদত রাষ্ট্রীয় দায়িত্বেই নবী করীম (স:)-এর সময়ে পালিত হয়েছে।

আমরা মুসলিম নারী। নারী হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সে দায়িত্বই হচ্ছে, মানব সমাজের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, সবচেয়ে মহান দায়িত্ব। আর তা হলো, মানুষ গড়ার দায়িত্ব, জাতি গড়ার দায়িত্ব। আমাদের এ মহান দায়িত্ব পালনের উপর নির্ভর করছে ইসলামী সমাজ গঠনের সূচনা। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের উপর নির্ভর করছে সমগ্র জাতির সার্বিক কল্যাণ। আদর্শ, চরিত্রবান সুনাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে মায়েদের উপর। একটি আদর্শ, সুখী, সুন্দর পরিবার নির্ভর করছে একজন আদর্শ মা এবং একজন আদর্শ গৃহিণীর উপর। পরিবার সমাজের ভিত্তি। কাজেই ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে, চরিত্র গঠনে মৌলিক উপাদান সম্পর্কে, সুষ্ঠু ও নির্ভুল জ্ঞান থাকতে হবে। ওহীপ্রাপ্ত জ্ঞানই একমাত্র নির্ভুল জ্ঞান। অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, কল্যাণ-অকল্যাণের যে মানদণ্ড দান করেছেন, তা-ই হচ্ছে একমাত্র নির্ভুল মানদণ্ড। ইসলামী সমাজ গঠনে মায়েদের এ নির্ভুল মানদণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। মানবজীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদণ্ড হচ্ছে- আল কুরআন ও রাসূল (স:)-এর

সুন্নাহ। এ দুটো নির্ভুল জ্ঞানের উৎস থেকে অবশ্যই মুসলিম মায়েদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং সর্বপ্রথম সে জ্ঞানকে নিজেদের জীবনেই প্রয়োগ করতে হবে। এরপর মায়েরা, গৃহিণীরা তা পরিবারে প্রয়োগ করবেন। এভাবে তারা ইসলামী পরিবার গঠন করে ইসলামী সমাজ গঠনে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারেন।

ইসলামী সমাজ গঠনে মুসলিম নারীসমাজের যথার্থ ভূমিকা রাখতে হলে ইসলাম তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, সে সম্পর্কে অবশ্যই তাদেরকে সচেতন হতে হবে। তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের উপর নির্ভর করছে সমগ্র জাতির তথা সমগ্র মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ। নারীর এ দায়িত্বের ব্যাপারে অবশ্যই মূল্য দিতে হবে। জাতিকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, মায়েরা যদি তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে না পারেন, তাদেরকে যদি তাদের মূল দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নিয়ে পুরুষের দায়িত্ব পালনে টানা-হেঁচড়া করা হয় এবং তারা যদি আদর্শ সন্তান গড়ার সুযোগ না পান তাহলে জাতি কখনো চরিত্রবান, আল্লাহভীরু, দায়িত্বশীল, আদর্শ নাগরিক পেতে পারে না। ফলে দায়িত্বশীল, চরিত্রবান নাগরিকের অভাবে সমস্ত জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে বাধ্য। যার অভাব আজকে আমরা সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে দারুণভাবে উপলব্ধি করছি। আজকে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি ঢুকেছে, জাতীয় নৈতিক অবক্ষয় যে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, ইসলামী নৈতিক জ্ঞানের অভাবই এর একমাত্র কারণ। একটি সন্তান নৈতিক চরিত্রবান হতে পারে, মানবীয় গুণাবলির বিকাশ শুধুমাত্র বস্তুবাদী শিক্ষায় কারো কারো মধ্যে সম্ভব হতে পারে; কিন্তু একে স্থিতিশীলতা ও পূর্ণতা দান করে ইসলামী নৈতিকতা তথা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান।

ইসলামী সমাজ গঠনে নারীসমাজের ভূমিকা পালন করতে হলে মুসলিম নারীসমাজকে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম আমূল পরিবর্তন দরকার। মুসলিম নারীকে তার কর্মক্ষেত্রে পারফেক্ট করে গড়ে তোলার জন্য নারীর উপযোগী জ্ঞান দানের সঙ্গে সঙ্গে তাকে কুরআন-সুন্নাহর নির্ভুল জ্ঞানে অভিজ্ঞ করে তুলতে হবে। ভবিষ্যৎ জীবনে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে

অভিজ্ঞ এ মায়েরাই জাতি গড়ার মহাদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে। জাতিকে উপহার দিতে পারবে আল্লাহভীরু, চরিত্রবান আদর্শ নাগরিক। যে শিশু মায়ের কোল থেকেই তার স্রষ্টার নাম শিখবে, ধীরে ধীরে তার মায়ের কাছেই তার স্রষ্টা আল্লাহকে চিনবে। মায়ের মুখেই নবী-রাসূলের কাহিনী, রাসূলের সাহাবীদের গল্প, তাঁদের আত্মত্যাগের কাহিনী, মুসলিমদের বিজয় যুগের কাহিনী শুনে বড় হতে থাকবে। আরো বড় হয়ে মায়ের কাছে কুরআনের অর্থসহ বাণী শুনবে, শেষ নবীর হাদীসের উপদেশ শুনবে, শিখবে, সে সন্তান কখনো বড় হয়ে খোদাদ্রোহী হতে পারে না। আজ মুসলিম ঘরের সন্তানেরা ইসলামের যতখানি দুশমনি করছে, তাদের মধ্যে যারা খোদাদ্রোহিতায় লিপ্ত, তারা একজন অমুসলিমের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়; বরং কয়েক গুণ বেশি। এর একমাত্র কারণ, মুসলিম মায়েরা তাদের সন্তানদের কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান দিতে পারেননি। আজ মুসলিম সমাজে ইসলামের সঠিক জ্ঞানের বড় অভাব। আর একমাত্র ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অভাবেই আজ মুসলিম জাতিকে চারদিক থেকে বিপর্যয় ঘিরে রেখেছে। এ বিপর্যয় থেকে মুক্তির একমাত্র পথই হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সত্যিকার মুসলমানরূপে গড়ে তোলা। প্রতিটি মুসলিম সন্তানকে মায়েরা যখন প্রকৃত মুসলমান করে গড়ে তুলতে পারবেন, প্রতিটি পরিবার যখন হবে ইসলামী পরিবার, তখনই ইনশাআল্লাহ ইসলামী সমাজ গঠনের সূচনা হবে। কাজেই বোনেরা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে, ইসলামী সমাজ গঠনে নারী সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মুসলিম নারী সমাজের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত ইসলামী সমাজ গঠনের আশা সুদূর পরাহত।

ইসলামী সমাজ গঠনে যেমন ইসলামী নেতৃত্ব প্রয়োজন, তেমনি ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীরও প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের ব্যাপক প্রচার, প্রসার। শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করা। প্রতিটি স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাসপাতালে, জেলখানায়, মহল্লায়, মসজিদে, ইয়াতীমখানায়, প্রতিটি সংগঠন, সংস্থায় সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন কুরআন-হাদীসের তাফসীরের ব্যবস্থা করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী সাহিত্যালোচনার মাধ্যমে ইসলাম

সম্পর্কে সর্বস্তরের নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাঝে সুষ্ঠু ও সুন্দর ধারণা সৃষ্টি হবে। ইসলামের উপকারিতা, কল্যাণকারিতা, উপযোগিতা সকল স্তরের মানুষ উপলব্ধি করবে, তখন ইসলামী সমাজ গঠনও ত্বরান্বিত হবে। ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহিলারা গার্লস স্কুলে, গার্লস কলেজে, ছাত্রীদের হোস্টেলে, মহল্লায়-মহল্লায় নারীসমাজের কাছে সপ্তাহে একদিন কুরআন-সুন্নাহর তাফসীর করলে মুসলিম নারীরা ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভে সক্ষম হবেন। এ ব্যাপারে শিক্ষিতা মা বোনেরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। শিক্ষিতা মা ও বোনেরা অর্থসহ কুরআন ও হাদীস পড়া নিজেদের প্রতিদিনের কাজের সাথে তালিকাভুক্ত করুন। এর জন্য কিছু সময় ব্যয় করুন। আপনার সন্তানকে নৈতিক চরিত্রবান, আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য আপনার এটুকু সময় ব্যয় করা অপরিহার্য। আপনার ইসলামী জ্ঞানের উপর নির্ভর করছে- আপনার সন্তান ও আপনার পরিবারের ইহকালীন কল্যাণ, শান্তি ও পরকালীন চিরস্থায়ী নাজাত ও মুক্তি। আপনি কিছুদিন কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে অধ্যয়ন করুন। কুরআন- হাদীসের জ্ঞানার্জনে আপনি একটি ঘণ্টা সময় ব্যয় করুন। দেখবেন, আপনি নিজেই ভাবতে শুরু করবেন যে, আল্লাহ এবং রাসূলের কথাগুলো এত সুন্দর! আমার সন্তানদের, আমার পরিবারের সদস্যদের নিকট এ মর্মস্পর্শী বাণী পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন। তখনি আপনি আপনার স্বামী-সন্তান এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সপ্তাহে একদিন বসুন ঘরোয়া পরিবেশে। আল্লাহর বাণী থেকে যে শিক্ষা আপনি পেয়েছেন, রাসূল (স:)-এর যে সুন্দর কথাগুলো আপনি জেনেছেন, তা তাদেরকে শোনান।

আল কুরআনের বাণী থেকে তাদেরকে শোনান- "এবং তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর দাসত্ব করো, তার সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করো এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথীর প্রতি এবং তোমাদের অধীন ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করো। নিশ্চিত জেনে রাখো, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না, যে নিজ ধারণায়

অহংকারী ও নিজেকে বড় মনে করে গর্বে বিভ্রান্ত। সেসব লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না, যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং অন্য লোককেও কার্পণ্য করার উপদেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে। এ ধরনের লোকদের জন্য আমরা অপমানকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি।" [সূরা ৪; আন-নিসা ৩৬-৩৭]

এ ধরনের আরো অনেক উপদেশ, সুসংবাদ, সাবধান বাণী আপনার স্বামী-সন্তানদের, আপনার পরিবারের সদস্যদের পড়ে শোনাতে পারেন। দেখবেন, সবাই এক আল্লাহর বান্দা, মুসলিম হয়ে গড়ে উঠবে। সবাই তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। সন্তান পিতামাতার প্রতি, স্বামী স্ত্রীর প্রতি, স্ত্রী স্বামীর প্রতি সহনশীল, ধৈর্যশীল হয়ে উঠবেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও একে অপরের প্রতি সহনশীল, ধৈর্যশীল, দায়িত্বশীল হবেন। এভাবে প্রতিটি পরিবারে ইসলামের জ্ঞান বিস্তার করে মুসলিম নারীরা ইসলামী সমাজ গঠনে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন।

এ সুদীর্ঘ আলোচনায় আমি ইসলামী সমাজ গঠনে নারী সমাজ কী ভূমিকা পালন করতে পারেন, কীভাবে ইসলামী সমাজ গঠনে সহায়ক শক্তি হতে পারেন- এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কিন্তু ইসলামী সমাজ গঠনের পথে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কেও আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে না পারলে ইসলামী সমাজ গঠন সম্ভব নয়।

ইসলামী সমাজ গঠনে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে- মুসলিম সমাজে ইসলামে নিষিদ্ধ বা হারাম কাজের ব্যাপক প্রসার। কুরআনে নিষিদ্ধ বা হারাম কাজ যতক্ষণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকে, ততক্ষণ সে সমাজ ইসলামী সমাজ হতে পারে না। নগ্নতা, অশ্লীলতা, মদ, জুয়া, ব্যভিচারের মতো হারাম কাজ সমাজে চালু থাকলে, সেখানে ইসলামী সমাজ গঠন সম্ভব নয়। পর্দাহীনতা, সহশিক্ষা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা জাতীয় খোদাদ্রোহিতা সমাজে প্রচলিত থাকা অবস্থায় ইসলামী সমাজের সূচনাই হতে পারে না। এসব হারাম কাজ বা বেহায়াপনা মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র, ঈমানী শক্তি ঘুনের ন্যায় কুরে কুরে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ইসলামী সমাজ গঠনের সূচনায় সমাজ থেকে এসব হারাম ও অশ্লীল কাজ নির্মূল করার জন্য পুরুষ সমাজের সাথে নারীদের পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। সিনেমা, টিভি হচ্ছে

শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। এই প্রচার যন্ত্রগুলোতে সবরকম ব্যবস্থাপনায় খোদাদ্রোহিতা প্রকট। যেখানে ইসলাম নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক করে বন্টন করে দিয়েছে, সেখানে মুসলিম দেশে একটা খবর পড়তেও একজন নারী একজন পুরুষ না হলে আমাদের টিভি কর্তৃপক্ষের চলে না। এটা স্পষ্ট খোদাদ্রোহিতা। অশ্লীল নাচ, গান, বাদ্য-বাজনা আল্লাহর রাসূল (স:) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি বাদ্যযন্ত্র নির্মূল করার জন্যই দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছি' (আল হাদীস)। বাদ্য-বাজনার সুর-লহরীর তালে তালে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যভিচারের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে দেখেও মুসলিম সমাজ বাদ্য-বাজনার, সুর-লহরীর কসরত করছে। পাশ্চাত্য সমাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। গোলামি আর কাকে বলে? রাজনৈতিক গোলামি থেকে মুসলমান যদিও বা মুক্তি পেয়েছে; কিন্তু সাংস্কৃতিক গোলামির শৃঙ্খলে এখনো মুসলিম জাতি পুরোপুরি বন্দি হয়ে আছে। মুসলিম নারীসমাজকে এসব দিকেও কড়া নজর রাখতে হবে। বিদেশি সংস্কৃতির স্বকীয়তা বজায় রেখে মুসলিম নারীকে ইসলামী সমাজ গঠনে সহায়তা করতে হবে। মুসলিম নারীরা প্রথমে নিজেদের জীবন থেকে ইসলাম বিরোধী কাজ বর্জন করুন। তারপর পরিবারের দিকে তাকান। দেখুন, কোথাও কোনো নিষিদ্ধ কাজ চোখে পড়ে কি না। যেখানে যেটুকু চোখে পড়ে, একটি একটি করে সংশোধন করুন। সিনেমা, টিভি যতদিন সংস্কার-সংশোধন না হচ্ছে, বিদেশি সংস্কৃতি বর্জন করে যতদিন না মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রচার হচ্ছে, ততদিন মুসলিম নারীরা টেলিভিশন, সিনেমা বর্জন করুন। সমস্ত হারাম কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই ইসলামী সমাজ গঠন সম্ভবপর হবে। মুসলিম নর-নারীর জন্য ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা ফরযে আইন। কারণ,

১. অনৈসলামিক সমাজে মুসলমান দ্বীন-ঈমান নিয়ে বাঁচতে পারে না।

২. আল্লাহর ফরয ইবাদত যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয় না।

৩. মানুষ মানুষের মর্যাদা পেতে পারে না।

৪. মানুষ তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

৫. মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

সর্বশেষে আমি যে কথাটি বলতে চাই তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাঁর খলীফা করে মানবসমাজে তাঁর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, সে দায়িত্ব একা পালন করা কোনোদিন সম্ভব নয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ○

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু (ইসলামকে) জামাআতবদ্ধ হয়ে শক্তভাবে ধারণ করো। তোমরা দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না।" [সূরা ৩; আলে ইমরান-১০৩]

নবী করীম (স:) ইরশাদ করেছেন, 'আমাকে আল্লাহ তা'আলা পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি। আর তা হচ্ছে, তোমরা তিন জন মুসলিম একত্র হলেই জামাআতবদ্ধ হয়ে যাবে। একজনকে নেতা বানিয়ে নেবে। নেতার নির্দেশ মেনে চলবে, আল্লাহর দ্বীনের জন্য জিহাদ করবে, আল্লাহর দ্বীনের জন্য হিজরত করবে।' এমনি একটি জামাআত থেকে যে এক বিঘৎ পরিমাণ দূরে সরে যাবে, সে যেন তার কাঁধ থেকে ইসলামের জোয়াল খুলে ফেলল; যতক্ষণ না সে জামাআতে ফিরে আসে। যদি কেউ (দ্বীন ইসলাম ব্যতীত) কোনো জাহিলী মতবাদের দিকে কাউকে আহ্বান করে, তাহলে সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে সালাত আদায় করে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলমান বলে ধারণা করে।' (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা:) বলেছেন, لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ 'জামাআত ছাড়া ইসলামের কোনো অস্তিত্বই নেই।' কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মুসলমানের জন্য জামাআতবদ্ধ জীবন ফরয। কারণ, এ ছাড়া মুসলমান থাকা সম্ভব নয়। এর সাথে সাথে জিহাদ এবং হিজরতের কথা বলা হয়েছে। জিহাদ মানে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। আল্লাহর দ্বীন ইসলাম কায়েমের জন্য একজন মুসলিম তার জানমাল দিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। প্রয়োজনে হিজরত করবে; কিন্তু বাতিল সমাজের সঙ্গে আপোস করা চলবে না। কেননা, আল্লাহর দ্বীন

ইসলাম মানবসমাজে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মানবতার কল্যাণ সাধন কোনো উপায়ে সম্ভব নয়। এ জন্য জামাআতবদ্ধ হয়ে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা আল্লাহর নির্দেশ, রাসূলের নির্দেশ। বাতিলের সাথে আপস না করে হিজরত করাই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ।

আরো স্মরণ রাখা দরকার যে, মুসলমান জামাআতবদ্ধ হবে শুধুমাত্র আল্লাহর দেয়া দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। অন্য কোনো মনগড়া মতবাদ বা থিউরি নিয়ে নয়। ইসলাম ব্যতীত মানুষের মনগড়া সমস্ত মতবাদই জাহিলিয়াত বা অজ্ঞতা। আল্লাহর বিধান ইসলাম, একমাত্র নির্ভুল জীবনবিধান। কাজেই মুসলিম নারী-পুরুষ তার শক্তি, সামর্থ্য, অর্থ-সম্পদ সবকিছু ব্যয় করবে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম কায়েমের জন্য; অন্য কোনো মতবাদের জন্য নয়। সালাত, সাওম পালন করেও কেউ যদি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে মানুষের তৈরি ইজম কায়েমের চেষ্টা করে, তার পরিণতি হবে জাহান্নাম- এ কথা পরিষ্কারভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আমি কুরআন ও হাদীসের আলোকে জামাআতবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। কুরআন-হাদীসের নির্দেশ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জামাআতবদ্ধ জীবনের শরয়ী গুরুত্ব রয়েছে। কাজেই এটি ফরযে আইন। যারাই ইসলামকে সত্যিকারভাবে গ্রহণ করলো, ইসলাম কায়েমের গুরুত্ব উপলব্ধি করলো, তাদের ইসলামী জামাআতে শামিল হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। হাদীসে রাসূলে ইরশাদ হয়েছে,

"যে ব্যক্তি জিহাদ করলো না, জিহাদের চিন্তা, সংকল্প এবং বাসনাও মনে পোষণ করলো না, সে পরিষ্কার মুনাফিকের ন্যায় মৃত্যুবরণ করলো।" [মুসলিম]

কুরআন-হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মুসলমান জন্মগতভাবে একটি মিশনারি জাতি। এক একটি মুসলিম এক একটি মিশন। শুধু নিজে ইবাদত করে, নামায-রোযা করে, আরামে খেয়েপরে ঘুমিয়ে কাটানোর জন্য তাকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়নি। তাকে বিশেষ যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে তার নিজের নাফসের সাথে, পরিবারের সাথে, সমাজের সাথে সংগ্রাম করে, জিহাদ করে যেতে হবে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার

জন্য। দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে- এই হচ্ছে মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য হাসিল করা ছাড়া তার দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা, আখিরাতে নাজাতের কোনো উপায় নেই। কাজেই যারা দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জামাআতে শামিল হওয়াকে রাজনীতি মনে করেন তাদের ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

বাংলাদেশে যেসব ইসলামী দল রয়েছে, আপনার দৃষ্টিতে আপনি যেটা পছন্দ করেন, আপনার বিবেক যে দলকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দল বলে মনে করে, আপনি সেই দলের সাথে শামিল হয়ে কাজ করুন। আর না হয় আপনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একটি ইসলামী জামাআত গঠন করুন এবং দ্বীন ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করে যান। এই চেষ্টাই আপনার সাফল্য। মুসলমানের জিন্দেগীর এটাই একমাত্র লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে আবর্তিত করেই তার কাজকর্ম সমাধা করতে হবে।

আপনার সন্তানও সামাজিক জীব। তার পক্ষেও একা থাকা সম্ভব নয়। তারও সঙ্গী-সাথী দরকার। আর সে সঙ্গী-সাথী যেমন চরিত্রের হবে, আপনার সন্তানের উপর তার প্রভাব পড়বেই। আল কুরআনেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'শয়তান যার সঙ্গী হয়েছে, তার খুব খারাপ সঙ্গীই জুটেছে।' বর্তমান অনৈসলামিক সমাজে আপনি আপনার সন্তানের জন্য কোনো ভালো সঙ্গী পাবেন না। তাদের জন্যও সংগঠন প্রয়োজন। বাংলাদেশে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত উন্নতমানের ইসলামী সংগঠন রয়েছে- এসব সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির ও ইসলামী ছাত্রী সংস্থা নামে পরিচিত। ইসলামের দুশমন, মানবতার দুশমন, ইহুদি, খ্রিস্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র এবং এদেশে তাদের পোষ্য দোসররা জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির এবং ইসলামী ছাত্রী সংস্থার বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত মিডিয়া ব্যবহার করে চলেছে। এমনকি সেক্যুলার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পাঠ্যপুস্তকে পর্যন্ত এসব সুসংগঠিত, শিক্ষিত ও ইসলামী দলগুলোর বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে মিথ্যা বানোয়াট প্রচারে উঠেপড়ে লেগেছে। এসব ইসলামের দুশমনরা এবং তাদের দোসররা যেখানে-সেখানে এসব ইসলামী নৈতিক চরিত্রবান ছেলেগুলোকে হত্যা করাচ্ছে। এ পর্যন্ত ছাত্রশিবিরের এবং

জামায়াতের বহু নেতাকর্মী হত্যা করেছে এসব পাষণ্ডরা। আর তাদের মিডিয়াগুলো সব সময় মিথ্যা বানোয়াট তথ্য প্রচার করে বেড়ায় যে,

শিবির হাত কাটে, রগ কাটে। প্রায়ই এসব ইসলামের দুশমনরা নিজেদের দলীয় কোন্দলে নিজেদের কর্মীদের পর্যন্ত হাত কেটে দেয়, রগ কেটে দেয়। আর পরক্ষণেই প্রচার করে বেড়ায়, শিবির হাত কেটেছে, রগ কেটেছে। এরা জানে যে, গোয়েবলসীয় কায়দায় একটা মিথ্যাকে দশবার বললে সত্যে পরিণত হবেই। এসব খুনী, সন্ত্রাসী, ইসলামের কট্টর দুশমনরা ইসলামের শত্রুতা চিরদিনই করেছে। রাসূল (স:)-এর সময়ও করেছে, আজও করছে, ভবিষ্যতেও করবে।

এদের প্রচারণায় আমাদের বিভ্রান্ত হলে চলবে না। আমাদেরকে সত্যের উপর অটল থাকতে হবে। আমাদের সন্তানদের অবশ্যই ভালো সঙ্গদানের জন্য ইসলামী জ্ঞানার্জনের সুযোগ দানের জন্য, সত্যের সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই ছেলেসন্তানদের পাঁচ বছর বয়স থেকে ফুলকুড়িতে শামিল করে দিতে হবে এবং ১০/১২ বছর বয়স থেকে বলিষ্ঠ ইসলামী ছাত্র সংগঠন, ইসলামী ছাত্রশিবিরে যোগদান করিয়ে দিতে হবে।

এখন আপনারা বলুন,, এরা কী ধরনের মিথ্যা প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালায়! ইসলামী ছাত্রশিবিরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনারা জেনে নিন। এসব ছেলেগুলো নামাযী, রোযাদার, এরা মদ্যপান করে না, গাঁজা টানে না, হেরোইন সেবন করে না। এরা শিক্ষকের গায়ে হাত তোলে না, মেয়েদের উত্যক্ত করে না। বাবা-মার সঙ্গে বেয়াদবি করে না। এরা হলো ইসলামী ছাত্র সংগঠনের ছেলে ইসলামী ছাত্রশিবির। এরা প্রতিদিন সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক ও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করে। প্রতিদিন তারা পাঠ্যসূচির সাথে কুরআন-হাদীস অর্থসহ অধ্যয়নের অভ্যাস করে এবং ব্যক্তিজীবনে কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান মেনে চলার চেষ্টা করে। নিজেদের সহপাঠিদের ইসলামের সুন্দর শাশ্বত অনুশাসন মেনে চলার জন্য, কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসাহিত করে, আল্লাহপ্রদত্ত রাসূলের প্রদর্শিত ইসলামের সুন্দর পথে চলার জন্য তাদের আহ্বান জানায়। এরা সপ্তাহে এক দিন মসজিদে বা মহল্লায় কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর বাসায় ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় বসে এবং

সহপাঠিদের ইসলামী জ্ঞানার্জনে এবং ইসলামের অনুশীলনে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে। এভাবে এ যুবকেরা সমাজের অসংখ্য পাপের হাতছানিকে দু'পায়ে দলে, সমাজের যুবক-কিশোরদেরকে সমাজের যাবতীয় অন্যায় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে ইসলামের শাশ্বত কল্যাণের পথে চলতে বন্ধুর মতো সঙ্গ দিয়ে সহায়তা করে। এসব সুন্দর মার্জিত স্বভাবের ছেলেদের সম্পর্কে এত মিথ্যা বানোয়াট অপপ্রচার করা হয় যে, ইসলামী ছাত্রশিবিরের নাম শুনলেই আপনারা আঁৎকে উঠেন। এভাবে মিডিয়ার বদৌলতে ইসলামের দুশমনরা সাফল্যই অর্জন করেছে বলতে হবে। শিবির সম্পর্কে ইসলামবিদ্বেষী দলের এক যুবকের মন্তব্য শুনুন:

আমার বোনের ছেলে ডা. জুলফিকার। ছাত্র ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে তাকে গান গাইতে নিয়ে যায়। একদিন ডা. জুলফিকার আমার কাছে দুঃখ করে বললো–খালাম্মা কি বলবো, ছাত্র ইউনিয়নের একটি ছেলে তাকে বলেছে, 'ভাই, শিবিরের ছেলেগুলোকে মারতে যে কী কষ্ট লাগে! ভাই বলে ডাকে, সালাম দিয়ে কথা বলে। কি করবো, পার্টির নির্দেশ, তাই মারতে হয়।'

আরেক দিন ডা. জুলফিকার আমার কাছে এসে বলে, খালাম্মা, আমরা কয়েকজন ডা. স্টুডেন্ট মিলে একটা বেবি-ট্যাক্সি কিনতে চাই। ড্রাইভার হিসেবে একটা শিবিরের গরীব ছেলে দিতে পারেন? শিবিরের ছেলে কেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তখন হেসে বলে যে, না, আমরা বেবি-ট্যাক্সি কিনবো। আমরা তো জানি যে, শিবিরের ছেলেরা কখনো তেল চুরি করবে না, বলে হেসে দিল। আমি আর গরীব শিবিরের ছেলে ড্রাইভার যোগাড় করে দিতে পারিনি। ওরাও আর বেবি-ট্যাক্সি কিনেনি। এরা কিন্তু সব ইউনিয়নের ছেলে। এরাও জানে যে, শিবিরের ছেলেগুলো চরিত্রবান। অথচ দুশমনী করে শিবিরের বিরুদ্ধে শুধু একটিমাত্র কারণে। আর তা হলো, এ ছেলেগুলো আল্লাহর পথে, রাসূলের পথে, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে চায়। দেশের স্বার্থে, মানুষের কল্যাণের স্বার্থে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এটাই তাদের গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধের কারণেই তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

يُرِيۡدُوۡنَ لِيُطۡفِـُٔوۡا نُوۡرَ اللّٰهِ بِاَفۡوَاهِهِمۡ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوۡرِهٖ وَلَوۡ كَرِهَ الۡكٰفِرُوۡنَ ۝

"এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূর (দ্বীন ইসলামকে) নিভিয়ে দিতে চায়; আর আল্লাহর এটাই ফায়সালা যে, অবিশ্বাসীরা যতই অপছন্দ করুক, তিনি তাঁর নূরকে (দ্বীনকে) পূর্ণরূপে প্রকাশ করবেনই।" [সূরা ৬১; সফ্ ৮]

এটা আল্লাহর ওয়াদা। এরা কোনোদিন আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করতে পারবে না; বরং এরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়া ও আখিরাতে এরাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরা ইসলামের বিরোধিতা করে অন্ধের মতো। অথচ এরা জানে না, ইসলাম ছাড়া কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। তিন তিনটি সরকার বাংলাদেশে ক্ষমতায় গিয়েছে। দুজন মহিলা নেত্রী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে সংসদে অবস্থান করেছেন; কিন্তু আপনারাই কসম করে বলুন, দেশের সন্ত্রাস, নারীনির্যাতন, নারীধর্ষণ এতটুকু কি কমেছে? পতিতাদের সংখ্যা কমেছে নাকি বেড়েছে আপনারাই বলুন।

দারিদ্র্য বেকারত্বের কোনো অবসান হয়নি; বরং তা দিন দিন আরো প্রকট আকার ধারণ করছে। যার ফলে সমাজে ছিনতাই, রাহাজানি, ব্যাংক লুট, ব্যবসায়ী খুন করে টাকা ছিনতাই ইত্যাদির সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আপনারা ভালো করে জেনে নিন যে, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা, ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া কোনোদিন নারীনির্যাতন, নারীধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি, বেকারত্ব ও দারিদ্রের অবসান হবে না।

কাজেই ইসলামের দুশমনদের অপপ্রচারে মোটেও বিভ্রান্ত হবেন না। আমি যখন পার্লামেন্টে ছিলাম বিগত ১৯৯১-১৯৯৬ সেশনে, তখন একদিন বিএনপি'র মহিলা এমপি শামছুন্নাহর বললেন, আপা, শিবিরের ছেলেগুলো যে কী ভদ্র, কী নম্র! এমপি হোস্টেলে উনার ফ্ল্যাটের পাশের ফ্ল্যাট থেকে বের হলে শিবিরের ছেলেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ছেলেরা সালাম দিয়ে কথা বলে। তিনি শিবিরের ছেলেদের প্রশংসা করে কথাগুলো বললেন।

শিবিরের ছেলে মানেই একটি ভালো সঙ্গ, ভালো বন্ধু, আপনার ছেলের জন্য। ইসলামী ছাত্রী সংস্থাও আপনার মেয়ের জন্য অনুরূপ একটি কল্যাণের ইসলামী ছাত্রী সংগঠন। আপনি আপনার ছেলেমেয়েকে সেসব সংগঠনের সাথে শামিল করে দিন। আপনার কোনো চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না। ছয় মাসের মধ্যেই আপনার ছেলেমেয়ে নামাযী হবে। ইসলামী জ্ঞানে আপনার ছেলেমেয়ের চরিত্র সুন্দর হবে। ইসলামী সংগঠনে, ইসলামী চরিত্রের সঙ্গীর প্রভাবে আপনার সন্তানের মধ্যে দিন দিন ইসলামী জ্ঞান বাড়তে থাকবে। ফলে সে নিজেকে সমাজের খারাপ পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে চলার যোগ্যতা অর্জন করবে এবং ভবিষ্যতে আপনার এসব ইসলামী চরিত্রের সন্তানেরা ইসলামী সমাজ গঠনের সবচেয়ে বড় সহায়ক হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে আল্লাহর পথে চলার, আল্লাহর দ্বীনের পথে স্বামী-সন্তানদের পরিচালিত করার এবং আল্লাহর জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শরীক থাকার তাওফীক দান করুন এবং বাংলাদেশকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করে বিশ্বের দরবারে এর গৌরব বৃদ্ধি করুন, বাংলাদেশকে একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করুন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করুন।

আসুন, আমরা বাংলাদেশের মুসলিম নারীসমাজ ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে যথার্থ ভূমিকা পালন করে ন্যায় ও ইনসাফের দ্বীন ইসলাম কায়েমের পথকে সুগম করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন!

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১. বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদিস –অধ্যাপক মফিজুর রহমান
২. সদস্য প্রার্থীদের মানোন্নয়ন গাইড –ড. মোঃ আলমগীর বিশ্বাস
৩. আদর্শ প্রতিবেশী আদর্শ সমাজ –ড. মোঃ আলমগীর বিশ্বাস
৪. আখিরাতে সফল হতে চাই –অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
৫. দারসে কুরআন (১–৯) –অধ্যাপক আবদুল মতিন
৬. রাহে আমল (১–২) –আল্লামা জলিল আহসান নদভী (রহ.)
৭. চল্লিশ হাদীস –ইমাম আন-নববী রহ.
৮. কবীরা গুনাহ –ইমাম আয্‌যাহাবী (র.)
৯. ইসলামী সমাজ গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা –হাফেজা আসমা খাতুন

BTC

তাইয়্যিম বুক কর্ণার

৪৩৫/ক, ওয়্যারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা–১২১৭

মোবাইল : ০১৭৪০-৬০১৯১৯